উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বিপর্যয়ে সাহায্যের আবেদন!

উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও প্লাবনের কারণে পর্যটক ও তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও সেখানকার কয়েক হাজার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা সেই গ্রামগুলিতে আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে চাইছি। যোগাযোগ : শমীক (০৩৩–২৪১৪৭৭৩০), জিতেন (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬), রামজীবন (০৩৫৮২–২৫৮৩৪৬))

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 3 1august 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১ আগস্ট ২০১৩ বৃহস্পতিবার ২ টাকা

• উত্তরাখণ্ড জলবিদ্যুৎ পৃ ২ • নয়াবস্তি পৃ ৩ • ভোট দিল বহু মহিলা পৃ ৩ • ঈদের কেনাকাটা পৃ ৩ • গঙ্গা পৃ ৪ • অরণ্য সপ্তাহ পৃ ৪ • শোভা ঘোষ পৃ ৪

বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের মানুষ ও প্রকৃতি

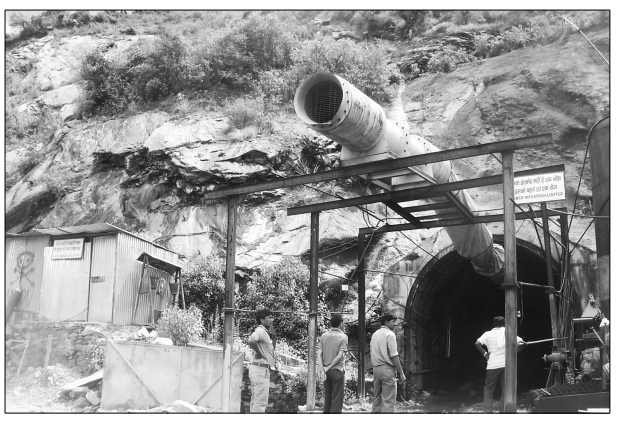

প্রথম ছবি — হৃষিকেশ থেকে শুরু করে রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী ... সর্বত্র বাসস্ট্যান্ডে নিখোঁজ পর্যটকদের ছবি দিয়ে পোস্টার, কোনোটা ছাপা রঙিন, কোনোটা হাতে লেখা সাদা কালো। দ্বিতীয় ছবি—মন্দাকিনী নদীর ওপর ঝুলছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাজারের একাংশ। অগস্ত্যমুনি, ২৬ জুলাই. ছবি শমীক সরকার। তৃতীয় ছবি — ল্যানকো কোম্পানির জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পাহাড় চিরে বানানো টানেল, মন্দাকিনীর ধারা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ফাটা, ২৭ জুলাই.

‘কেদার ফ্যাক্টরি’ বন্ধ, কতদিন গ্রাম আঁকড়ে থাকবে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জেলা রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ?

শমীক সরকার, গুপ্তকাশী, ২৯ জুলাই •

বছর চল্লিশ আগে কেদারধাম যাওয়ার উপায় ছিল কেবল পায়ে হেঁটে যাওয়া। তখন মে থেকে অক্টোবর এই ছয়মাসের সিজনে দিনে বড়ো জোর দেড়শো লোক যেত কেদারধাম। তারপর গৌরিকুণ্ড অবধি পাকা রাস্তা তৈরি হয়। সেখান থেকে কেদারধাম ১৪ কিমি পায়ে হাঁটা পথ। মাঝে রামবড়াতে হল্ট করার জায়গায় বড়ো বাজার। আর কেদারধাম পুরোদস্তুর শহর। এই আজকের কেদার। তবে, বছর কয়েক আগের কেদার আর এখনকার কেদারের মধ্যে ফারাক আছে। দুবছর আগে অবধি মাত্র দুটো হেলিকপ্টার যাত্রী নিয়ে কেদার যেত। দুবছর আগে সংখ্যাটা বেড়ে হয় এগারো। বিভিন্ন কোম্পানির বদান্যতায় গুপ্তকাশি, উখিমঠ, ফাটার গ্রামের পাশে পাশে গজিয়েছে হেলিপ্যাড। বাড়ছে আরও। ছয়জন যাত্রী নিয়ে দিনের দিন কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেদারে গিয়ে পুজো দিয়ে নিয়ে আসছে হেলিকপ্টার। ৭৭০০ টাকা ভাড়া মাথাপিছু। এতে সঙ্কট ঘনিয়েছে কেদারকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা আশেপাশের কয়েকশো গ্রামের হাজার হাজার মানুষের পেশায়। তাদের কেউ সিজনে পালকি নিয়ে, যাত্রী পিঠে নিয়ে, রাস্তায় অস্থায়ী ধাবা খুলে হাজির হয়ে যেত। তাছাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসা আর কেদারের পুরোহিত-পাণ্ডারাও দেখেছিল সিঁদুরে মেঘ। তাই ১৪ জুন থেকে ধর্মঘট চলছিল কেদারে। চলছিল অনশন। প্রশাসনের হস্তক্ষেপেও জট কাটেনি। ফলে তিন দিনের সমস্ত যাত্রী আর তাদের স্থানীয় সঙ্গীরা আটকে পড়েছিল। কেউ কেদারধামে, কেউ রাস্তায় রামবড়ায়, গৌরীকুণ্ডে, শোনপ্রয়াগে। সে কারণে ১৬–১৭ জুনের প্লাবনের সময় ওই এলাকায় প্রায় তিনদিনের সমান পর্যটক ছিল। মেখন্ডা গ্রামের লীলাদেবী থেকে বারাসুর প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, সবার এক মত — কেদারে এত মৃত্যুর কারণ এটাই।

এরপর দুইয়ের পাতায়

মণিপুরের ভুয়ো সংঘর্ষের মুখোশ খুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত কমিশন

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

মণিপুরে অবৈধভাবে হত্যা হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের একটি সংস্থা ‘একস্ট্রা জুডিসিয়াল একজিকিউশন ভিক্টিম ফ্যামিলিজ অ্যাসোসিয়েশন’ এবং অন্যান্যদের ২০১২ সালের একটি আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ৪ জানুয়ারি ২০১৩ একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনে নিযুক্ত চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এন সন্তোষ হেগড়ে এবং দুই সদস্য যে এম লিংদো ও ডঃ অজয় কুমার সিং-কে ১২ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয় সম্পূর্ণ তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। যদিও আবেদনকারীরা বহু হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ২০০৯–২০১০ সালের প্রথম ৬টি ঘটনা নিয়ে কমিশনকে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশন ৩০ মার্চ রিপোর্ট পেশ করে। এতে প্রমাণিত হয়, এই ৬টি ঘটনায় মৃত আজাদ খান, খাম্‌বঙময়ুম অর্সনজিত, নামেইরাকপাম গোবিন মেইতেই, নামেইরাকপাম নোবো মেইতেই, এলাঙবাম কিরণজিত সিং, চোঙথাম উমাকান্ত এবং আকোইজাম প্রিয়ব্রত কোনো সংঘর্ষে যুক্ত ছিলেন না এবং (নিরাপত্তা বাহিনীর) কেউ আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের ওপর গুলি চালায়নি।

কমিশন এই পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মোট ২২টি সুপারিশ করেছে। ২০০৪ সালে আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের হাতে থাঙজাম মনোরমার হত্যাকাণ্ডের পর মণিপুর উপত্যকায় গণ-আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জীবন রেড্ডি কমিটিকে AFSPA র ফলাফলের পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দেয়। সেই কমিটি শুনানির পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে বলা হয়েছিল, AFSPA হল ‘দমনের প্রতীক, ঘৃণার সামগ্রী এবং বিভেদ ও স্বেচ্ছাচারের হাতিয়ার’। এখনকার এই কমিশন সেই রিপোর্ট অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খতিয়ে দেখেছে এবং শ্রদ্ধাশীলভাবে তার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে।

ঘোড়া–খচ্চর খুইয়ে, রোজগারের পথ হারিয়ে থমকে গিয়েছে কেদারঘাটি–গুপ্তকাশি–উখিমঠ–কালিমঠের গ্রামগুলো

মুনিশ, সম্পাদক, নাগরিক পত্রিকা, গুপ্তকাশি, ২৯ জুলাই •

১৬–১৭ তারিখের বিপর্যয়ের পর ২০ জুন আমাদের একটা টিম গিয়েছিল উত্তরকাশি। ওখানকার কিছু গ্রামে আমাদের টিম যায়। গ্রামগুলোর অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কিছু লোক গম কাঁচাকাঁচাই খাচ্ছিল। যারা অসুস্থ ছিল, আমরা তাদের চিকিৎসাও করেছি। তারপর আমরা তিনটি টিম বানাই। একটা টিম পিথোরাগড়, একটা টিম পৌরির দিকে আর একটা টিম এই কেদারঘাটির দিকে যায়। এই টিমগুলি সমীক্ষা করে ফিরে আসার পর আমরা বুঝি, ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি কেদারঘাটিতেই হয়েছে। প্রথমে আমাদের ধারণা ছিল, এখানে হাই প্রোফাইল টুরিস্টরা মারা গেছে, তাই মিডিয়া এবং সরকার এই জায়গাটাকে হাইলাইট করছে বেশি। কিন্তু তা সত্যি নয়।

১৩ জুলাই আমরা শ্রমিক-ছাত্র-ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠন মিলে ‘উত্তরাখণ্ড আপদা রাহাত মঞ্চ’ বানিয়ে গুপ্তকাশী–উখিমঠ–কালিমঠে এসে আমাদের ঘাঁটি তৈরি করি। প্রথমে আমাদের টিমে চারজন ডাক্তার, চারজন সমাজকর্মী এবং একজন মেডিক্যাল ছাত্র ছিল। আমরা তারপর গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যেতে শুরু করি। বেশি করে সেই সব ঘরগুলোতে আমরা যাচ্ছিলাম, যেগুলোর লোকেরা কেদারনাথ ধামে কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু আর ফেরেনি। আমরা অসুস্থদের ওষুধ দিতে শুরু করি। প্রথম দুদিন আমরা উখিমঠের কিছু গ্রামে ঘুরছিলাম। উখিমঠ রুদ্রপ্রয়াগ জেলার একটা তহশিল এলাকা। তারপর আমরা কালিমঠ ঘাটির গ্রামগুলোতে কাজ করা শুরু করি। এই কালিমঠ এলাকা আমরা পুরোটাই হেঁটে হেঁটে চড়াই উতরাই ভেঙে গিয়েছি। রাউনলেক নামে এখানে একটা বড়ো বাজার এলাকা আছে। সেখানে আমরা গেছি। ওই জায়গাটার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সংযোগের মাধ্যম জুগাসু ব্রিজ। কিন্তু ওর পাশ দিয়েই গেছে এপিসি জলবিদ্যুত কোম্পানির একটা টানেল। তার জন্য ওই ব্রিজটা এই প্লাবনে ভেঙে গেছে। ওখানে যাওয়ার রাস্তাও ভেঙে গেছে। গাড়ি যাচ্ছে না। ওখানে পায়ে হেঁটে পৌঁছানোর পর আমরা মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাই। তাতে বহু সংখ্যায় রোগী আমাদের ক্যাম্পে আসে। ওখানকার সেইসব ঘরগুলোতে আমরা গেছি, যেসব ঘরের ছেলেরা কেদারঘাটিতে ওই সময় কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেনি এখনো। ঘরের মেয়েরা পাথরে ঠেস দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে বসেছিল। আমরা কিছু তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দিচ্ছিল না। ওদের চোখের শূন্যতা এবং ভার আমরা ভাঙতে পারিনি। ওদের মধ্যে অনেকেরই শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও ওরা আমাদের কাছে এসে ওষুধ চায়নি।

আমাদের মনে হয়েছে, এই উখিমঠ তহশীলের গ্রামগুলোর মানুষের জীবন দুই দিক থেকে সামনে যাওয়ার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। এক, সত্যি সত্যিই কেদারঘাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, ঘরের সক্ষম পুরুষ হারিয়ে যাওয়ার ফলে, দামি খচ্চর খোয়ানোর কারণে বাস্তবেই রাস্তা বন্ধ। দুই, গ্রামের স্কুলে পড়া বাচ্চা ছেলেদের হারিয়ে তাদের জীবনের যাত্রাও থমকে গেছে।

কালিমঠের একটা গ্রামে এক মহিলার সাথে আমাদের আলাপ হয়। নাম আশা দেবী। ওঁর স্বামী ১৬ তারিখ কেদারঘাটিতে মারা যায়। ওইদিনই ওর বাচ্চা মেয়ে জন্মায় ঘরে। কেউ তাকে টিটেনাস বা বিসিজি ইঞ্জেকশন দেয়নি। একদিকে কেদার নিয়ে উত্তরাখণ্ড সরকার এত কথা বলছে, অন্যদিকে এই হাল। আরেকটি গ্রামে একজন মহিলাকে আমরা দেখি, যাঁর বর ফেরেনি কেদার থেকে। অনেকদিন পর পর্যন্ত ওর আশা ছিল, ফিরবে। কারণ গ্রামের লোক এক-দুজন করে বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত ফিরছিল। যখন ও বুঝতে পারে, আর ফিরবে না, তখন সে এতটাই ভেঙে পড়ে যে ওর সাত মাসের বাচ্চা মিসক্যারেজ হয়ে যায়। তার পর ওর লাগাতার ব্লিডিং শুরু হয়। আমাদের টিমের ডাক্তাররা ওকে কিছুটা শুশ্রূষা করতে সক্ষম হয়। একটি গ্রামে এক ৭৫ বছরের বুড়ির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর ছেলে সমেত ১১ জন আত্মীয় মারা গেছে কেদারঘাটিতে। তিনি এমন করে কাঁদছিলেন, আমি আমার ক্যামেরাটুকু তাঁর সামনে বের করে ধরতে পারিনি। আটকে গেছি। একটি গ্রামে এক বৃদ্ধ লোকের পরিবারের ৬ জন কেদারঘাটি থেকে আর ফেরেনি। তার কান্না দেখা যাচ্ছিল না।

কেদারঘাটির দুঃখে ভারাক্রান্ত এই গ্রামগুলোতে সরকার বলে কিছু হাজির নেই। কারো ঘরে ফাটল ধরেছে ভূমিধসে। কারোর ঘোড়া খচ্চর মরে গেছে। কিন্তু তাদের যদি সরকারের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পেতে হয়, তাহলে উখিমঠ অথবা গুপ্তকাশি আসতে হবে পায়ে হেঁটে। সরকারের তরফে তাদের দুঃখ দুর্দশা সহানুভূতির সঙ্গে শোনার জন্য কেউ নেই। সরকারি মেশিনারি পুরোপুরি ব্যর্থ।

আইপিএল জুয়ায় লাখ লাখ টাকা ধার, বিষ খেয়ে মরল চিত্ত

সুবীর বিশ্বাস, ছাত্র, এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার •

একটা ছোটো ঘটনা, বেশিদিন আগেরও নয়, এই জুন মাসের ১৬ তারিখ, রবিবার। সব জ্বালা যন্ত্রনার অবসান হল চিত্তরঞ্জনের জীবন থেকে। এটা এক ছেলের গল্প; গল্প এক নেশাখোরের। যে নিজের জীবনটাকে দিয়ে দেওয়ার সময় একবারও ভাবেনি তার সদ্যোজাত পুত্রটির কথা বা তার বধূ গরীনির কথা। চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা সানু বিশ্বাস, একটা ছোটো ভাইও আছে, নাম উদয় বিশ্বাস। এক বোনের এখনও বিয়ে হয়নি, বাকিগুলির অবশ্য বিয়ে হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন ছোটো থেকে পড়াশোনায় ভালোই ছিল। আমার মনে আছে, একদিন সে-ই আমাদের পেটভাতা জুনিয়র হাই স্কুলের ক্রিকেটে জয় এনে দিয়েছিল। কিন্তু তখনকার চিত্ত আর এখনকার চিত্ত — রাত্রি আর দিনের পার্থক্য। IPL খেলার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। কেউবা আনন্দ পায়, কেউবা আনন্দ দেয়। কিন্তু এই IPL চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে গিয়েছিল বিনোদনের এক বিপরীত জগতে — কালোটাকা, হুমকি তথা খারাপ পৃথিবীর জগতে। যেখানে একবার গেলে আর ফিরে আসার পথ থাকে না।

২০১২ সালের IPL -এ চিত্তরঞ্জন কিছু জুয়াখোর নেশাবিদদের পাল্লায় পড়ে শুরু করে জুয়াড়িদের জীবন। শুকটাবাড়ি সে যেত সেলুনের কাজে। সেদিন ছিল IPL -এর ফাইনাল কলকাতা নাইট রাইডার্স বা KKR বনাম চেন্নাই সুপার কিংস বা CSK। বাজিতে হেরেছিল লক্ষাধিক টাকা। তার মাথায় এমন নেশার মন্ত্র চেপেছিল যে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজি ধরতেও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাগ্য যতটুকু তার সঙ্গ দিয়েছিল, তার থেকে বেশিটাই কেড়ে নিয়েছিল। ফলে অনেক ঋণ। জমি বেচে সেই ঋণ পরিশোধ করেছিল তার পরিবার। অনেক ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছিল পরিবারের কাছ থেকে।

আবার সেই IPL ম্যাচ, সেই বাজি। এবার কিন্তু জায়গাটা আলাদা — শুকটাবাড়ি না, অসম বাংলা ভুটান সীমান্ত — জয়গাঁ। নেশাখোর আর জুয়াড়িদের ঘাঁটি। মেজাজ হারিয়ে চিত্তরঞ্জন শুরু করেছিল তার জুয়াতে আহুতি দেওয়া। সেমিফাইনালের দিন দুই লক্ষ টাকার আহুতি এবং ফাইনালে CSK -এর পক্ষে চার লক্ষ টাকা বাজি ধরেছিল সে। কিন্তু তাকে আবার হারতে হয়েছিল। শুধু আইপিএলের বাজি নয়, জয়গাঁতেই নিয়মিত ১০–১৫ হাজার টাকার লটারি কাটত চিত্ত এই আইপিএলের টাকা পরিশোধের জন্যে। এতে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে ঋণের বোঝা। তাকে পাওনাদারেরা চাপ দিতে থাকে, কিন্তু সে টাকা দেবে কোথা থেকে? কাজেই তাকে মৃত্যুভয় দেখানো শুরু হতে থাকে। সে ভয় পেয়ে তার বাড়িতে জানায়। বাড়িতে প্রথমে তার ওপর রাগ করে থাকলেও কিছু সাহায্য করতে সমর্থ হয়। এরপর পাওনাদারের কাছ থেকে আরও চাপ আসলে বাড়ির লোকও তাকে মরতেই বলে। কিন্তু একইসাথে তার বাবা ছোটো ছেলে উদয়কে দিয়ে কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

১৬ জুন রবিবার সকালটা চিন্তাভাবনা করে চিত্তরঞ্জন। দোকান খোলে আর দোকান যাবার আগে সে প্রথমে ঘুমের ওষুধ এবং ইঁদুর মারার বিষ খায় (পরবর্তীতে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তার পাকস্থলীতে এই সব জিনিসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়)। দোকানে থাকতে থাকতেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কাছে দিদির বাড়িতে যায়, আর সেখানেই জ্ঞান হারায়। তারপর স্থানীয় চিকিৎসক এসে দেখে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু জয়গাঁতে হাসপাতাল না থাকায়, তাকে বিকেলের দিকে গাড়িতে করে কোচবিহার আনার পথে সে হাসিমারা সংলগ্ন স্থানে মারা যায়। তারপর পোস্টমর্টেমের জন্যে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হয়।

IPL -এর মতো টুর্নামেন্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল সমাজের একেবারে ওপর মহল থেকে শুরু করে একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত কীভাবে ছড়িয়েছে জুয়ার বীজ। এভাবে শুধু একজন চিত্তরঞ্জনের ঘটনা থেকে আন্দাজ করতে পারি আরও কত চিত্তরঞ্জন এখনও এভাবেই ঘোরতর বিপদের মধ্যে আছে।

সম্পাদকের কথা

তৃণমূল এবং ‘তৃণমূল’

গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষে সমাজের তৃণমূল স্তরের অধিকাংশ মানুষ থাকে গ্রামে। তাই গ্রামপঞ্চায়েতকে ধরে নেওয়া হয় তৃণমূল স্তরের মানুষের একটা প্ল্যাটফর্ম। গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যকে মনে করা হয় সমাজের তৃণমূল স্তরের একজন প্রতিনিধি। গ্রামপঞ্চায়েতের ওপর থাকে পঞ্চায়েত সমিতি, তার ওপরে জেলা পরিষদ। ধাপে ধাপে এই পথ বেয়ে গ্রামের সঙ্গে সরকারের আঁতাত গড়ে ওঠেছে। এই পথে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা হয়েছে গ্রামকে, তৃণমূল স্তরের মানুষকে।

কিন্তু সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষ কি নিজেদের ভালোমন্দ নিয়ে সচ্ছন্দে কথা বলতে পারে গ্রামপঞ্চায়েতে? নিজেদের চাষের সমস্যা, জলের সমস্যা, রুজি-রোজগারের সমস্যা এবং সকলে মিলেমিশে বাঁচা নিয়ে কি এই প্ল্যাটফর্মে তারা কথা বলতে পারে?

আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটা গ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে গেলেন এক মহিলা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে। স্বামী-স্ত্রী অন্যের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষ করেন, নিজেদের জমিজমা নেই, মাঠে লেবারের কাজও করেন। এই মহিলা পার্টি-ফাটি তেমন বোঝেন না। স্বামী পার্টি করেন, সেই সুবাদে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল। এমনকী গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রামসভা নামে যে একটা ব্যাপার আছে, যেখানে সাধারণ গ্রামবাসী মতবিনিময় করতে পারে, সেটা আদৌ জানেন না। গ্রামপঞ্চায়েত মানে তিনি বোঝেন, কার বাড়ির সামনে একটা কল বসবে, কোথায় একটা ইলেকট্রিক পোস্ট বসবে, কোথায় একটা রাস্তা হবে ইত্যাদি। এককথায় এগুলোকে বলা হয় ‘উন্নয়ন’। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিপিএল কার্ড আর একশো দিনের কাজের বিলিবন্টন।

একসময় গ্রামপঞ্চায়েত বলতে বোঝাত বামফ্রন্টের ক্ষমতা। শ্রমজীবী, চাষি এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি ছিল বামপন্থী দল। তাদেরকেই গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল স্তরের মানুষের কথা বলবার যোগ্য বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু দিনে দিনে টের পাওয়া গেল তৃণমূল স্তরের মানুষের কোনো প্রতিনিধি নেই। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে রেশন-বিদ্রোহের সময় এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। সমস্ত দলকে বাদ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ওই বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল।

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ‘তৃণমূল’ দল গঠন হয়েছিল এই শূন্যতাকে পূরণ করার বাসনা থেকে। ‘তৃণমূল’ নামটাও বেছে নেওয়া হয়েছিল এই তৃণমূল স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার বাসনা থেকেই। এবারের পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে, ‘তৃণমূল’-এর সেই বাসনা অনেকটাই পূরণ হয়েছে।

কিন্তু পঞ্চায়েত কি এতদিনেও তৃণমূল স্তরের মানুষের একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে? এই প্রশ্নের উত্তর তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছ থেকেই পেতে হবে।

ভোটের ট্রেনিংয়ে অনেকেই নাম কাটাতে ব্যস্ত

২৭ জুলাই, কেশব চন্দ্র দে, সন্তোষপুর, মহেশতলা •

ভোট করাতে গিয়েছিলাম মথুরাপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণপুর-মন্দিরবাজার বিধানসভার অন্তর্গত কিল্লা গ্রামে। ট্রেনে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে ভোটের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে যেতে হয়েছিল একঘণ্টা বাসে চেপে ঘোড়াদল পেরিয়ে সেই কিল্লা গ্রামে।তার আগে ডায়মন্ডহারবারে গিয়েছিলাম ইলেকশন ট্রেনিং নিতে।

মহেশতলা থেকে বাসে বহুক্ষণে ডায়মন্ডহারবার গেছি।গিয়ে দেখি, ডায়মন্ডহারবারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পোলিং পার্টির ট্রেনিং চলছে। আমাদের পড়েছে রবীন্দ্রভবনে। প্রচুর মানুষ এসেছে ট্রেনিং নিতে। মথুরাপুর ব্লকের বিডিও নিজে ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত। তাঁর অধীনস্তরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা মানুষদের সামলাতে ব্যস্ত। বেশিরভাগ মানুষই তাদের নাম কাটাতে ব্যস্ত — সবাই অসুস্থ! তাই মেডিকাল গ্রাউন্ডে রেহাই চাই। হলে উপস্থিত হয়ে যখন আমাদের পোলিং পার্টির সঙ্গে পরিচিত হলাম, দেখলাম আমাদের দলের প্রিসাইডিং অফিসার অনুপস্থিত। শুনলাম এর আগে যখন শুধুমাত্র প্রিসাইডিং অফিসারদের ট্রেনিং হয়েছিল, সেখানেও তিনি উপস্থিত হননি। জানলাম, ভোটের দিন রিজার্ভ থেকে আমরা নতুন একজনকে পাব। দলের অন্যান্য সদস্যদের ফোন নাম্বার দেওয়া-নেওয়া করে বিদায় নেওয়ার আগে জানলাম, যে পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ হবে তাতে প্রতিটি ভোটারের জন্য অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। জিজ্ঞাসা করলাম, যে পোলিং স্টেশনে যাব, সেখানে ভোটারের সংখ্যা কত আর এই পদ্ধতিতে ঘণ্টায় মাত্র ১২ জন ভোট দিতে পারবে। তাহলে কতক্ষণ ভোটগ্রহণ চলবে? নির্বাচন কমিশনারের স্থির করে দেওয়া অফিসাররা সুন্দরভাবেই আমার এই বেয়ারা প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

খানিকটা দুর্লভ প্রজাতির এই পেঁচাটিকে কয়েকদিন আগে শান্তিপুর থানার মোড় অঞ্চলের একটি বড়ো গাছে ঘুড়ির সুতোয় পা জড়িয়ে ঝুলতে দেখা যায়। পরে স্থানীয় যুবকরা পেঁচাটিকে উদ্ধার করে। দীর্ঘক্ষণ ওইভাবে ঝোলার ফলে পেঁচাটির পা দারুণভাবে জখম হয়, স্থানীয় বিজ্ঞান সংগঠন শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব-এর মনোজ প্রামাণিক ও অনুপম সাহা পেঁচাটিকে শুশ্রূষা করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন বলে জানা যাচ্ছে। জখম পেঁচাটির ফটো তুলেছেন নটু মণ্ডল।

উত্তরাখণ্ডের ছবি

ডানদিকে, গুপ্তকাশী এলাকার কেদারধামের পুরোহিত অধ্যুষিত খাট গ্রামে চিকিৎসাশিবির, ‘উত্তরাখণ্ড আপদা রাহাত মঞ্চ’-র ব্যবস্থাপনায় অসুস্থদের চিকিৎসায় বেনারসের চিকিৎসক অজিত। ২৭ জুলাই। বাঁদিকে ওপরে, ফাটায় পর্যটকদের কেদার নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবার হেলিপ্যাড। ২৮ জুলাই। বাঁদিকে নিচে , ল্যানকো কোম্পানির জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টানেল গেছে বাড়ির নিচ দিয়ে। আর বাড়িতে ধরেছে ফাটল। খাড়াই গ্রামের ছবি। মেখন্ডা মাল্লা গ্রামেও সব বাড়ির একই দশা। ২৮ জুলাই।

উত্তরাখণ্ড জুড়ে বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিই প্লাবনে সাধারণের ক্ষতি বাড়িয়েছে

গ্রামবাসীদের ওপর চলছে কোম্পানির দাদাগিরি সাথ দিচ্ছে প্রশাসন আর বড়ো দলগুলি

শ্রীমান চক্রবর্তী, ২৯ জুলাই, গুপ্তকাশী • ২৬শে জুলাই ভোরে দুন এক্সপ্রেস থেকে হরিদ্বারের আগে জ্বোয়ালাপুরে নেমে ক্রান্তিকারী মজদুর সংগঠনের অমিত কুমারের বাড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে ভোরেই গুপ্তকাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সাথী হয় কাটোদরের পঙ্কজ ভাই। পথে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল কেদারনাথের এই ভয়াবহতা সম্পর্কে। এর আগে অমিত কুমার বলছিলেন জুন মাসের ওই প্লাবনের পর অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার বেশ কয়েকটি চালু হয়েছে। সেদিনের সেই বানে বেশ কতগুলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। অমিত কুমার জানালেন উত্তরাখণ্ডে বিভিন্ন স্থান জুড়ে বড়ো বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিই এই জলপ্লাবনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যখন অগস্ত্যমুনিতে আমরা ট্রেকারে করে যাচ্ছি, তখন থেকেই ভালো ভাবে আমাদের কেদারনাথের বানের ধ্বংসলীলা চোখে পড়তে শুরু করল।

পঙ্কজ ভাইয়ের সাথে কথা বলে প্রথমে মনে হচ্ছিল যে এখানে বড়ো বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অগস্ত্যমুনি যেতে যেতে আমাদের সাথে বাসে আলাপ হয় কেদারঘাটির কেন্দ্রীয় সরকারি রক্ষী জি এস নোটিয়ালের সাথে। অগস্ত্যমুনি পৌঁছে আবার গাড়িতে করে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। হেঁটে যেতে যেতে কথায় কথায় নোটিয়াল জানিয়েছিল যে কেদারনাথের এই ধ্বংসলীলার বেশ বড়ো একটা কারণ জলবিদ্যুতের জন্য বানানো বড়ো বড়ো টানেল, আর পাহাড় ফাটানোর জন্য ব্যবহৃত ডিনামাইট বা আরডিএক্স। কারণ এই ব্লাস্টগুলির ফলে পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় আলগা হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে। গুপ্তকাশী থেকে ফাটা যাওয়ার পথে একটা ধ্বংস হওয়া ল্যানচো কোম্পানির টানেল চোখে পড়ল। যন্ত্রপাতি সব ভেসে গেছে, ফাঁকা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একজন বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশপাশ জুড়ে রয়েছে বীভৎস ভূমিক্ষয়ের চেহারা। নিচের দিকে একটা সেতুও ভেঙে পড়েছে। নিরাপত্তা রক্ষীর কথায় জানা গেল প্রচুর মেশিন বানের জলে আর ভূমিক্ষয়ের সাথে তলিয়ে গেছে। পথে আসতে আসতে পাহাড়ের ওপর থেকে অনেক জায়গায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তৈরি হওয়া বাঁধগুলির ভগ্ন অবস্থা বেশ কয়েক জায়গায় চোখে পড়ল।

ধানী গ্রামের শিব সিং পাটোয়ার জানালেন যে ফাটার ওপরে একটা টানেল গেছে। এই টানেলটা প্রায় ৯ কিমি লম্বা। উনি কথায় কথায় জানালেন যে বাঁধগুলির কারণে অনেক ক্ষতি বেড়ে গেছে। টানেল কাটার জন্য কোম্পানির লোকেরা ডিনামাইট ব্যবহার করে। প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে আশেপাশের ৪-৫ কিমি পাহাড়ের বুকে গ্রামগুলো কেঁপে ওঠে। শিব সিং জানান, কোম্পানি অনেককে টাকা দেয়, তাই কেউ কিছু বলে না। শিব সিংয়ের ছেলে অনিল জানায়, কোম্পানি এখানকার ছেলেদের চাকরি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। যেসব গ্রামে ওরা বাঁধ বানানোর কাজ করে সেখানকার অল্প কয়েকজনকে কাজ দিলেও অধিকাংশ কিছু কাজ পায় না। পেলেও বহু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ। অনেককে ওরা কাজে নিয়ে বসিয়ে রাখে কোনো কাজ না দিয়ে, আবার অনেককে কয়েক মাস পরে ছাড়িয়ে দেয়।

নাগরিক পত্রিকার সম্পাদক মুনিশ আমাদের জানান, কয়েক দিন আগে সীতাপুরের কাছে বিধ্বস্ত বাঁধ সরেজমিনে দেখেন। ওপরের দিক থেকে নদীর জলস্তরের অনেক ওপরে রয়েছে টানেলের মুখ, যেখান দিয়ে জল যাবে গতিতে বিদ্যুৎ তৈরির জন্য। মুনিশ এরপর নদীর উল্টোদিকে নিচের দিকে দেখেন নদীর জলস্তর বাড়ানোর জন্য তলা থেকে কংক্রিটের কয়েক মিটার লম্বা ও চওড়া গাঁথনি তোলা হয়েছে। এর ফলে নদীর ওই মুখটি সরু হয়ে গেছে। কেদারনাথের বানের সাথে জলের চাপ এইখানে প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং ভূমিক্ষয় বাড়িয়ে প্রচণ্ড মাত্রায় ধ্বংসলীলা চালায়। মুনিশ জানান, বিষয়টা বুঝতে তিনি ল্যানকো কোম্পানির জিএম-এর সাথে দেখা করেন। তিনি বিশেষ কিছু বলতে না চাইলেও একথা জানান এখানকার সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন শুরু হলে ৮৮ শতাংশ বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি নিজেরা বিক্রি করতে পারবে, আর ১২ শতাংশ তারা সরকারকে দেবে। মুনিশ জানালেন এই প্রকল্পগুলির থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অন্যত্র বিক্রির জন্য করা হচ্ছে। আর ধ্বংস করা হচ্ছে এখানকার পাহাড়ের পরিবেশ, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ। বিপন্ন হয়ে পড়ছে পাহাড়ের জনজীবন। তিনি এখানে ছোটো ছোটো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা জানালেন। তিনি জানালেন বহু জায়গায় বাঁধের কারণে ভূমিক্ষয় যেমন বেড়েছে, তার সাথে বেড়েছে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি। কোম্পানিগুলি নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য পাথর কাটার মেশিন ব্যবহার করে না। খরচ কমানোর জন্য ওরা বড়ো বড়ো বিস্ফোরণ ঘটায়, যাতে সুড়ঙ্গপথ খোদাইয়ের সময় কমানো যায়। ধানি গ্রামের যুবক অনিলও ওই একই কথা বলছিল। ফাটার খারাই গ্রামের একেবারে ওপরের দিকের বাসিন্দা দিওয়ান সিং রানা তাঁর ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে কথা বলতে বলতে জানালেন তাঁর বাড়ির ঘর ও উঠানের তলা দিয়ে টানেল গেছে। এর আগে ল্যানকো কোম্পানির টানেল বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটালে তাঁর নতুন বানানো ঘরের দেওয়াল ও ছাদের ঢালাইয়ে চিড় ধরে। জানলা দরজা আলগা হয়ে যায়। তিনি জানালেন কোম্পানির কর্মরত কর্মচারীদের কিছু বলতে গেলে তারা বলে, সরকার অনুমতি দিয়েছে, আমরা কিছু জানি না। অনেকবার এরকম ঝামেলা হওয়ায় ওরা কম তীব্রতার বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে তাও সাময়িক।

ফাটার কাছে মাখন্ডা মাল্লা গ্রামের লীলাদেবী, লাক্কি লাল, বৃজ লাল প্রমুখরা জানান, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যে ৯ কিমি দীর্ঘ টানেল তৈরি হয়েছে তার সূত্রপাত হয়েছে তাদের গ্রামের ওপরের পাহাড় থেকে। গত জুনের জলপ্লাবনে বহু জায়গায় ধসের কারণে টানেলের অংশ নষ্ট হয়েছে। তাঁদের কথায় প্লাবনের পর কোম্পানির লোকজন সবকিছু ছেড়ে চলে যায়, এদিকে গ্রামের তলা দিয়ে যে টানেল গেছে তার মধ্য দিয়ে এখন আর কোনো জল সরবরাহ হচ্ছে না। গ্রামের ছেলে ছোকরারাও আমাদের নিয়ে দেখায় যে কীভাবে টানেল বানানোর জন্য পাহাড়ের নিচের অংশের মাটি-পাথর কেটে ফেলায় ওপরের অংশ কমজোর হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির জল পড়ে ওপরের পাহাড় নরম হয়ে গিয়ে বহু জায়গা ধসে পড়েছে। ভূমিক্ষয়ের মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা আরও জানায় যে টানেলের খুঁড়ে বের হওয়া মাটি পাথর তারা আশে পাশেই জমিয়ে রাখে পাহাড়ের কোনো কোলে, যে মাটি বর্ষার জল পেয়ে নিজের ওজন বাড়িয়ে জলের ধারার সাথে ভারী আকারে নিচে নামে। উত্তরাখণ্ডের বহু স্থানে এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি পাথর জলের স্রোতের সাথে নদীর মধ্যে পড়ে নদীর গভীরতা কমিয়ে দেয়। একসাথে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির জল, গান্ধী সরোবরের জল, নদীর ভূমিক্ষয়ের বিশাল পরিমাণ মাটির সংযোগে জলপ্রবাহের স্তর যেমন বাড়ায় তেমনি তার ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মন্দাকিনী, অলকানন্দা, কালীগঙ্গা ধ্বংস যজ্ঞ চালাতে পারে।

মাখান্ডা গ্রামের বাসিন্দারা জানায়, প্রথমে ল্যানকো কোম্পানির তরফে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল গ্রামবাসীদের — কম্পিউটার সেন্টার, হাসপাতাল, ছেলেদের চাকরি সহ নানাকিছু, মাত্র কয়েকজন ছেলের চাকরি ছাড়া আর কিছুই তারা দেয়নি। আমরা জানতে চাই, এই বিস্ফোরণের ফলে যে ক্ষতি হল তা আপনারা সরকারের ওপরের মহলে জানাননি? ওরা জানায়, কোম্পানির লোকরা ওদের লোকেদের দিয়ে সমীক্ষা করিয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য করে। এর কোনো নিয়ম নেই। গ্রামের প্রত্যেকের ঘর ভাঙার জন্য কেউ দু-হাজার, কেউ চারহাজার, কেউ পাঁচহাজার, কেউ সাতহাজার টাকা করে পেয়েছে। তাদের মতে এই টাকা কেবলই মুখ বন্ধ রাখার জন্য। ছ-মাস আগে এই নিয়ে চেক বিলি হয়েছে। এসডিএম জানায় এই সব কিছু তো হচ্ছে আপনাদের ভালোর জন্য। গ্রামে সমীক্ষা করার পর সরকারের তরফে কোম্পানির লোকেদের নিয়ে প্রকল্পের আগে একটা জনশুনানি হয় ঠিকই কিন্তু সেটা গ্রামবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য। বিশাল মাত্রায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ পুলিশ আসে গ্রামে। এত পুলিশ দেখে গ্রামের অনেকেই ভয় পেয়ে আর কিছু বলতে পারে না। কেউ কেউ বিরোধিতা করলেও রাকেশ রাই নামে কোম্পানির একজন কর্মচারী পিস্তল দেখিয়ে গুলি করার হুমকি দেয়। কখনো কখনো কোম্পানির তরফে অযথা পুলিশি হেনস্থা আর গ্রেপ্তারের ভয়ও দেখায়। মাখান্ডার গ্রামবাসীরা জানায় কোম্পানি আমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে এখন চলে গেছে। সারা গ্রামের মধ্য দিয়ে টানেলের সুড়ঙ্গ চলে গেছে, এখন ওটা ফাঁকা, এই বর্ষায় ভূমিক্ষয়ে যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, আমরা সকলেই আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি।

ফেরার পথে গাড়িতে কথায় কথায় বারাসু গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকের কথা শুনে বুঝলাম, এখানকার সকলেই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সাথে বানানো বড়ো বড়ো বাঁধের বিপদ বা ডিনামাইট ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু সবকিছু নিয়েই চলে রাজনীতি। হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে উত্তরাখণ্ডের সাধারণ মানুষ এই সবকিছুই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তবে শিব সিং জানিয়েছিলেন, একজন সিপিএম নেতা এসে গ্রামে এই বাঁধ বানানোর বিরুদ্ধে বলেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর কথা কেউ শোনেনি। আজ তিনি সে কথা মনে করে আফশোস করছেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০৮ জন মহিলা ভোটারের মধ্যে ৩০০ জন ভোট দিল

২৬ জুলাই, শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ •

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত এনায়েতনগর মাগুরা এলাকায় ভোটকর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি এক দারুণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলাম। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংঘর্ষ, ভীতিপ্রদর্শন, বুথদখল, খুন-জখম প্রভৃতি ঘটনায় পূর্বের মতোই কলঙ্কিত, কালিমালিপ্ত। সেখানে তিন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের গ্রামপঞ্চায়েতের প্রার্থী একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন, গল্প করছেন, 'কোনো ঝামেলা হতে দেব না' বলে শপথ করছেন, চলতি অস্থিরতার বাজারে কি ভাবা যায়? তাই-ই করে দেখালেন মাগুরা এনায়েতনগরের প্রার্থী, সমর্থক ও বাসিন্দারা। এ এক অনন্য নজির। আশ্চর্যের কথা, ওই গ্রামে আমি কোনো মাতব্বরও দেখলাম না। যদিও আমি ভোটের আগের দিন এবং ভোটের দিন বেলা তিনটের পর পুরো পাড়াটা চষে বেড়িয়েছি। মানুষজনের একটাই কথা, যাকে সকলে মিলে বেছে নেবে, সেই জয়ী হবে। অবশ্যই সে পাড়ার জন্য কিছু কাজ করবে — এই তাদের আশা।

আমার ভোটকেন্দ্রটির নাম ছিল দারুস সালাম ফ্রি প্রাইমারি স্কুল। ভোটকেন্দ্রটি দুটি বুথে ভাগ করা হয়েছিল ৬৪/১ এবং ৬৪/২, মোট ভোটারের সংখ্যা ১৩০০। মোট ১১৫০ ভোট পোল হয়েছে। যাদের ভোট দেওয়া হয়নি, তাদের মধ্যে অন্তত ১০০ জন যুবক জীবন ও জীবিকার তাগিদে দেশের বাইরে আরবদেশে রয়েছে। সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। কোনো ঝামেলা নেই, নেই রেষারেষি। নামকরা খবরের কাগজের পাতায় প্রতিদিন জ্বলজ্বল করে — – মুসলিমপ্রধান এলাকায় খুন-জখম-রাজনৈতিক হানাহানির খবর। সরু সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা, দুপাশে গড়ে ওঠা ছোটো-বড়ো বাড়িঘর, পুকুর, মাঠ, চাষজমিতে মোড়া গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়োই মনোরম। তার চেয়েও মনোরম গ্রামবাসীদের ব্যবহার। ভোটের আবহ থেকে সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত এলাকা। অথচ বুথের লাইট, পাখা, বাথরুম তিনদলের কর্মী-সমর্থকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলেন এক ছোট্ট চা-দোকানের মালিক জাকিরদা। পরদিন দুপুরেও খাওয়া হল তাঁর কাছে। একেবারে আত্মীয়ের মতো ব্যবহার তাঁর।

ভোটের দিন সকাল থেকেই লম্বা লাইন। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এর একটা কারণও আছে। রমজান চলছে, প্রত্যেকেই রোজা রেখেছে। মহিলাদের অনেক কাজ। সংসার সামলানো, সন্ধ্যায় ইফতারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এত ব্যস্ততার মাঝেই আমার বুথে ৩০৮ জন মহিলা ভোটারের মধ্যে ৩০০ জন ভোট দিল। খবর নিয়ে জানলাম নবতিপর কয়েকজন মহিলা অসুস্থতার জন্য ভোট দিতে পারেনি। ওখানকার মহিলারা যেন পুরুষদের যোগ্য সঙ্গিনী। বোরখা পরার প্রচলন নেই। ওখানে মুসলিম হলেও ওদের কোনো আড়ষ্টতা, দ্বিধা নেই। অল্পবয়সি যুবতীরা পড়াশুনায় রত। দারুণভাবে মিশল ওরা, রসিকতার পাল্টা রসবোধ পাওয়া গেল ওদের কাছ থেকে। শহরের ভালো গুণগুলি গ্রহণ করলেও শহরের কৃত্রিমতার ছোঁয়া এখনও ওদের স্পর্শ করেনি। সহজ, সরল, গ্রাম্য সজীবতায় ওরা বেশ চনমনে।

কংগ্রেস-সিপিএমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই মারামারিতে পরিণত হয়নি

২৬ জুলাই, মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ •

২২ জুলাই নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ চার জেলায় ভোট হয়েছে। মুর্শিদাবাদ বরাবরই স্পর্শকাতর এলাকা, ভোটে মৃত্যুও হয় বেশি। কিন্তু তা হয় মূলত গঙ্গার পূর্ব পাড়ে, পশ্চিমে তেমন কিছু হয় না। এবারেও হয়নি। কান্দি মহকুমায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও মৃত্যুর কোনো খবর নেই। খড়গ্রাম থানার এড়োয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত উত্তেজনাপ্রবণ। সেখানকার একটি বুথে একজন কংগ্রেস কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তাঁর পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তাঁকে খড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পার্বতীপুরের বুথে লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের বচসা শুরু হলে কেন্দ্রীয় সেনা তাদের বেধড়ক পিটিয়ে থানায় নিয়ে যায়। থানা থেকে পরের দিন কোর্টে চালান দেয়, সেখান থেকে জামিনে ছাড়া পায়। যে ছ-জন গ্রেপ্তার হয়েছিল, তাদের দুজন সিপিএমের, চারজন কংগ্রেসের।

শঙ্করপুরে কংগ্রেসিরা বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট মারে বলে সিপিএমের অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভোটকর্মী বলেন, 'ভোট শান্তিতে হয়েছে। কিন্তু সে শান্তি শ্মশানের।' সেনাবাহিনী যখন এড়োয়ালি থানায় পৌঁছায়, তখন এক দফা কিল-চাপড়ের পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ভোট শুরু হওয়ার সময় আর পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি। তবে খড়গ্রাম বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কোনো ফ্যাক্টর নয়। কংগ্রেস-সিপিএমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও তা মারামারিতে পরিণত হয়নি।

ঈদের কেনাকাটার জন্য ফান্ড

১৭ জুলাই, জিতেন নন্দী, সন্তোষপুর, মহেশতলা •

রমজান মাস চলছে। ঘরে ঘরে চলছে রোজা বা উপবাস। সামনে ঈদের পরব। সন্ধের মুখে সন্তোষপুর স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মের ওপর শহীদুলের দোকান ফাঁকা। পাশের চপ্পলের দোকান এখনই গুটিয়ে দিচ্ছে। শহীদুল ফিবছর বর্ষায় ছাতা বিক্রি করে। এবছর দোকানের ওপরের তারে গুটিকয়েক কালো ছাতা ঝুলছে। নিচের তক্তার ওপর আর পিছনের রেলের রেলিং জুড়ে বাচ্চাদের রঙিন নতুন নতুন জামা প্যান্ট ফ্রক। হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি আসছে। মেঘের তেমন তর্জন-গর্জন নেই, নিঃশব্দে নেমে আসছে জলধারা। আবার থেমে যাচ্ছে, নিমেষে শুকনো। বৃষ্টি এলেই প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিতে হয় মালপত্র, না হলে ভিজে সব একসা হবে।

শহীদুল বলে, 'এখন তেমন বিক্রিবাটা নেই। পনেরো রোজার পর বাজার জমবে।'

— কেন?

— যারা ফান্ডে পয়সা রাখে, পনেরো রোজার পর পয়সাটা হাতে আসে। তখন সব কেনাকাটা করবে।

— ফান্ডে পয়সা রাখলে কিছু সুদ পাওয়া যায় নিশ্চয়?

— সুদ-টুদ দেয় না। একটা লটারি হয়। জমানো টাকার সঙ্গে একটা গিফ্‌ট দেয়। কাউকে বালতি, কাউকে গামলা, যার ভাগ্যে যেমন ওঠে। একটা জিনিস দেয়, এক্সট্রা পয়সা দেয় না।

— আশ্চর্য! টাকা জমালে ইন্টারেস্ট দেবে না? ব্যাঙ্কে-পোস্টাপিসে তো দেয়।

— সে জানি না। অল্প টাকা, হাতে রাখলে সংসারে খরচ হয়ে যায়। তাই লোকে ফান্ডে জমা রাখে। কেউ সপ্তাহে জমা দেয়, কেউ মাসে — সামান্য টাকা। মোটা টাকা রাখলে হয়তো সুদ-টুদ পাওয়া যেত। আমার জানা নেই।

ওই তো সামনে রেলগেটের আগে যে দোকানটা, লাভলি স্টোর্স, ওদের ফান্ড আছে। ওরা টাকা জমা রাখে। পনেরো রোজার পর টাকাটা একাট্টা করে ফেরত দেয়। ঈদের পর আবার জমানো শুরু হবে।

আর একটা ফান্ড আছে, ওটাকে বলে ঈদের ফান্ড। এই ধরুন। দশজনে মিলে মাসে মাসে একশো টাকা করে জমা রাখা হল। প্রতি মাসে লটারি হবে, তাতে যার নাম উঠবে, তাকে ধরুন পাঁচহাজার টাকা দেওয়া হল। আবার পরের মাসের লটারিতে আর একজন পাবে। কিন্তু সবাইকেই প্রতি মাসে একশো টাকা করে দিয়ে যেতে হবে।

বারাসাতের আঞ্চলিক পত্রিকা 'মফস্বলী'

মণিদীপা ভৌমিক, ২৫জুলাই, কলকাতা •

বারাসাত কাঙ্গাল হরিনাথ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সদস্যদের উদ্যোগে 'মফস্বলী' বলে একটা চার পাতার পত্রিকা বেরোচ্ছে। তার ৪টে সংখ্যা পড়লাম। পত্রিকাতে বারাসাত এবং তার লাগোয়া বাদু, শুস্তিয়া, নলকুঁড়ো ইত্যাদি জায়গার জনপদ সৃষ্টির ইতিহাস বেরোচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে। ছোট জাগুলিয়ার ইতিবৃত্ততে জায়গাটার নামকরণের পিছনে যে কারণগুলো সম্ভাব্য বলে লেখা হয়েছে সেগুলো বেশ মজার। যেমন মনসাদেবীর পূজা যে অব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা করেন তাদের বলা হয় আউলিয়া বা আউলে। একদিন ওইরকম এক বুড়ো আউলিয়া এবং একটা গোখরো সাপকে মনসাতলায় মৃত অবস্থায় একসাথে দেখতে পাওয়া যায়। তখন ওই আউলিয়ার ভক্তকুল আদিবাসী সমাজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বারবার বলতে থাকে 'জাগো আউলিয়া'। সেই থেকেই ওই গ্রামের নাম হয় জাগুলিয়া।

পত্রিকাটিতে সহজে দর্শন বোঝার জন্য একটা লেখা বেরচ্ছে যেটা খুব জরুরি বলে মনে হয়। সেখানে গ্রামশি এবং অনেক উত্তরাধুনিক দার্শনিকদের নিয়ে আলোচনা আছে। এছাড়া করাচীর পারভিন রহমানের কোথা জানা গেল যিনি ১৩ মার্চ করাচী শহরে খুন হয়েছেন। পারভিন কোন রাজনৈতিক দলের নন, তিনি মৌলবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই একটা আলাদা পরিসর গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা থাকবে।

এই পত্রিকা থেকে আরও বিশেষ ভাবে জানতে পারেই যে আম বট অশ্বত্থ মেহগিনি এইসব গাছ লাগালে দূষিত বাতাস বেশি পরিষ্কার হয় কারণ এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইডের মত ক্ষতিকর গ্যাস নিজেদের শরীরে শুষে নেয়। আরও জানা যায় জল সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন কীভাবে জল অপচয় হয় এবং কীভাবে জলের দূষণের প্রভাবে সারা বিশ্বে প্রতিবছরে ১।৮মিলিয়ান মানুষ মারা যায় পেতের অসুখে যার মধ্যে ৯০ শতাংশর বয়স ৫ বছরের নীচে।

ক্রিকেট খেলা যে শুধু আর নিছক খেলা নেই, সেটা যে এখন গণ জুয়ায় পরিণত হয়েছে এটাও জানা যায় এই পত্রিকা থেকে। এই ক্রিকেট জুয়ায় আক্রান্ত এখন গরীব কেরানি থেকে খেটে খাওয়া শ্রমিক, রিকশাওয়ালা সবাই। ফলে তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছে, ঘরের প্রয়োজনের টাকা হারাচ্ছে জুয়া খেলে। কোন সামাজিক সংগঠন এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে না । ফলে এটা এখন রমরমিয়ে চলছে এই অঞ্চলগুলোতে।

এইভাবে বারাসাতে নিজস্ব অঞ্চলের মুক্তমঞ্চ, অ্যাথলেটিকস কোচিং সেন্টার, সংস্কৃতি জগতে সেরকম খ্যাতি পাননি অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরকম কিছু মানুষ যেমন গোপাল উড়ে এবং হরু ঠাকুরের কোথা থেকে শুরু করে শাহবাগ আন্দোলন, উগো সাভেজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খবর এই পত্রিকার মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। এই পত্রিকা পড়তে বেশীরভাগ পত্রিকা পড়ুয়ারই ভালো লাগার কোথা। এই পত্রিকার মত বিভিন্ন জায়গা থেকে আঞ্চলিক পত্রিকা বেরোলে বেশ ভালো হবে বলে মনে হয়।

আকড়া ফটক নয়াবস্তিতে জল নেই

২৪ জুলাই, জিতেন নন্দী, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা •

মহেশতলা পৌর এলাকার ৭নং ওয়ার্ডের লাগোয়া আকড়া ফটকের গঙ্গার ধারে রয়েছে অনেকগুলি ইটভাটা। ইটভাটার আশেপাশে বেশ কটি বস্তি রয়েছে। এগুলো সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। কিন্তু আমাদের পুর বা নাগরিক জীবনের সঙ্গে নানান সম্পর্কে এগুলি যুক্ত। এই বর্ষায় যখন আকাশ ফুটো হয়ে জল ঝরে চলেছে, তখন এখানকার নয়াবস্তির মানুষ জলকষ্টে ভুগছে। আমি যখন ওখানে পৌঁছালাম, বৃষ্টি পড়ছে। একটা নতুন চাপাকল বসানো হয়েছে বটে। কিন্তু জল উঠছে না। তার হাতলটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাইটট্র্যাকের স্কুলঘরটা খুলে দেওয়া হল। আলাপ হল বাসিন্দা লীলাদেবী, হোসেনারা বেগম, ৭নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির প্রতিনিধি চেঙ্গিজ আর রাইটট্র্যাকের কর্মী আশা সামন্তের সঙ্গে।

লীলাদেবী নয়াবস্তিতে ২৫-৩০ বছর আছেন। হোসেনারা বেগম বিয়ে হয়ে এখানে এসেছিলেন ২০ বছর আগে। ওঁর বাপের বাড়ি বজবজে। দুজনেই বাঙালি মেয়ে, স্বামীরা বিহারি। চেঙ্গিজ ছোটোবেলা থেকে এখানে আছেন, আগে লালপোলে থাকতেন। বললেন, 'একখানা ঘর ছিল। আমরা তিনচার ভাই, কী করব? এখানে এসে ঘর করলাম।'

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, চারমাস আগে মার্চ নাগাদ এই কলটা পুরসভা থেকে বসানো হয়েছে। কলটা বসানোর পর যখন পাম্প করা হল, জল উঠল না। তখন পুরসভায় রিপোর্ট করা হল। ওরা বলল, যা হবে (পঞ্চায়েত) নির্বাচনের পর। রাইটট্র্যাক থেকে পুরসভাকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছিল। পুরসভা একইদিনে একটা ষোলোবিঘায় আর একটা নয়াবস্তিতে বসিয়েছে। জল যখন উঠল না, তখন মিস্ত্রিকে ফোন করা হয়েছিল। মিস্ত্রি এসেছিল, সে বলল, এই পাইপ তুলে নতুন লাইন বসাতে হবে। সামনে একটা টাইমকল আছে, সেটা ভাঙা, জল ওঠে না। নয়াবস্তিতে কোনো কলই নেই। লোকে গঙ্গার জল খায় আর নয়তো ইটভাটা থেকে জল আনতে হয়। ইটভাটাগুলোতে চাপাকল আছে।

হোসেনারা বেগম বললেন, 'পানির জন্য আমরা অভিযোগ জানিয়েছিলাম। জলের জন্য আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। অনেক যুদ্ধ করে কলটা আমরা বসালাম। রাস্তাঘাট আমাদের চলার মতো নয়। এই দুটোই আমাদের সবথেকে বড়ো কষ্ট। কোনখানে গেলে আমাদের হক আমরা পাব বুঝতে পারছিলাম না। রাইটট্র্যাক থেকে আমাদের দেখিয়েছে, এইভাবে এইভাবে করলে তোমরা হক পাবে।'

আট-দশটা পায়খানার জন্য রাইটট্র্যাক থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছু লোক এখানে আপত্তি করে। ব্রিকবোর্ড জায়গা দেয়নি। এটা ব্রিকবোর্ডের জায়গা। তাই পায়খানা হল না। তৃণমূল আসার পর অবশ্য বছরখানেক হল দুটো পায়খানা হয়েছে। যেখানে ওরা আগে করতে দেয়নি, সেখানেই হয়েছে এই দুটো। ভাটা-মালিকেরা তৃণমূলের সাপোর্টার।

চেঙ্গিজ বলেন, 'নয়াবস্তিতে চারশো ঘর। একটা পায়খানা করবে বলে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, আমাদের এখানে পায়খানা লাগবে না। আপনি এক কাজ করুন, ওই পায়খানা অন্য জায়গায় বসিয়ে দিন। আমাদের মেয়েদের জঙ্গলে যাওয়া অভ্যেস আছে। আমরা এখানে রাজনীতি করতে এসেছি, মা-বোনেদের খিস্তি খেতে আসিনি। তাও তো জলের জন্য কথা শুনতে হচ্ছে। তারপর দুটো পায়খানা তৈরি হল।'

চেঙ্গিজ আরও বলেন, 'তিন ইঞ্চি পাইপ, তিনশো মিটার জুড়ে চেঞ্জ করতে হবে, তবে জল আসবে। খাটালের মুখ পর্যন্ত কমপ্লিট পাইপ এসে গেছে। ১নং আর ৫নং বস্তি বাকি আছে। ধানখেতির ভেতরে ১৭নং বস্তি, নতুন বস্তি আর ১নং বস্তিতে জলের সমস্যা। বাকি কোনো জায়গায় জলের সমস্যা নেই।'

আকড়া ফটকের সর্বোদয় স্কুলেও বাচ্চাদের জলের কষ্ট। এটা হিন্দি স্কুল। এখানে নয়াবস্তির বাচ্চারা পড়ে। এখানে জল দিচ্ছে না। বাচ্চারা পড়ছে। দিদিমণিরা বলছে, আমরা কী করব? আমাদের জল নেই। ওরা পার্টি অফিসে জানিয়েছে, এমএলএ-কেও জানিয়েছে। স্কুলের বাইরে একটা টাইমকল আছে। ওখানে দিনে দুবার টাইমে জল আসে। চাপাকল নেই। স্কুলে একটা বাথরুম আছে, সেখানে টিচারদের জন্য জল তুলে রাখে। সরকার থেকেও কোনো ব্যবস্থা নেই।

বাঙালি ছেলেমেয়েরা পড়ে নবরত্ন স্কুলে। চাপাকল আছে ওই স্কুলে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাচ্চারা এইসব বস্তি থেকে এই দুটো স্কুলে যায়।

প্রথম পাতার পর

এসব কিছুই আমরা শুনছিলাম কেদারের রাস্তায় গুপ্তকাশী-উখিমঠ এলাকায় কয়েকটি গ্রামে চিকিৎসা শিবিরে যোগ দিয়ে। সংবাদমন্থন পত্রিকার তরফে আমি আর শ্রীমান ২৪ জুলাই প্রায় কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই রওনা দিয়েছিলাম কলকাতা থেকে গুপ্তকাশীর উদ্দেশ্যে। হরিদ্বার-হৃষিকেশ এলাকায় কিছু বামপন্থী সংগঠনের তৈরি করা এই চিকিৎসা শিবিরগুলির হাতে আমরা দশ হাজার টাকা তুলে দিই। তার মধ্যে ছিল আমাদের পত্রিকার তরফে তোলা সাড়ে ছ-হাজার টাকা, আর 'আন্দোলনের সংলাপ' পত্রিকা কর্মীদের তোলা সাড়ে তিন হাজার টাকা। আমরা দু-দিন এই শিবিরগুলিতে অংশ নিই। ২৭ জুলাই ফাটা-র কাছে খাট, ধানীগাঁও এবং ২৮ জুলাই খাড়াই এবং মেখণ্ডা গ্রামে। ২৭ জুলাই রাতটা আমরা কাটাই ধানী গাঁও-এর শিবসিংয়ের পরিবারের আতিথ্যে।

আমরা যেসব পাহাড়ি গ্রামে গেছে, সব গ্রামেই ১ থেকে ৫৫ জন যুবক কেদারনাথের বিপর্যয়ের পর আর ফেরেনি। ঘোড়া খচ্চর যে কত মারা গেছে তার হিসেব নেই। মে-জুন মাসে স্কুলে ছুটি পড়ে। তাই একমাস রোজগারের ধান্ধায় এইসব গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার স্কুলপড়ুয়া কেদারে চলে গিয়েছিল। কেউ আবার এমনিই গেছিল কেদার, ছুটিতে। একটি হিসেব পাওয়া গেল এরকম, উখিমঠ এলাকারই ৫৮৬ জন হারিয়ে গেছে বা মারা গেছে। এর মধ্যে দেড়শোর বয়স ১৬-র নিচে। ১৬ জুন সন্ধ্যেয় এবং ১৭ তারিখ ভোরবেলায় যে বান আসে মন্দাকিনী উপচে গিয়ে, তার ধাক্কায় ছত্রভঙ্গ কেদার শহর থেকে পালিয়ে আশেপাশের পাহাড়গুলোতে ছুটে গিয়েছিল এই পাহাড়ি গ্রামের যুবকরা। অনেকেই তাই বেঁচে ফিরেছে। আবার অনেকেই পারেনি, ফিরে আসার পথে নদী পার হতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছে।

তবে এলাকার যত মানুষ মারা গেছে, সেই তুলনায় নেপাল থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ, এমনকী জম্মু থেকে আসা পর্যটনশিল্পের সাথে বা রাস্তা সারাই ও অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত শ্রমিক ও পর্যটকের মৃত্যু অনেক বেশি। কারণ, পাহাড়ি অবস্থা সম্পর্কে তাদের অনভিজ্ঞতা। দৈনিক জাগরণ পত্রিকায় ২৪ জুলাই প্রকাশিত উত্তরাখণ্ড সরকারের বয়ান অনুযায়ী, নেপাল সহ ভারতের উনিশটি রাজ্যের থেকে নিখোঁজ মোট ৫৪৬৬ জন। তার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের ৯৩৪ জন। তার মধ্যে এই রুদ্রপ্রয়াগ জেলা (যেখানে কেদারঘাটি) থেকেই ৬৫৩ জন। এটা শুধু নিখোঁজের হিসেব। মৃতদেহ যাদের পাওয়া গেছে, সেই হিসেব আলাদা। স্থানীয়দের মত, মোট মৃত কুড়ি হাজারের মতো।

উত্তরাখণ্ড সরকার মৃত ও নিখোঁজদের জন্য পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। কেউ বলছে, ডেথ সার্টিফিকেট দিলে তবেই মিলবে এই টাকা, অর্থাৎ শুধু মৃতদের ক্ষতিপূরণ. কারো বক্তব্য, নিখোঁজদেরও দেওয়া হবে। পরে ফিরে এলে ফেরত দিতে হবে। নইলে শাস্তি। একটা খচ্চর কিনতে লাগে এক লাখ টাকা, কিন্তু খচ্চরের ক্ষতিপূরণ ২০ হাজার। তেমনি পালকি পিছুও কিছু ক্ষতিপূরণ ধরা হয়েছে। কিন্তু কত তা শুনলাম না।, কেদার এলাকায় প্রতিদিন কত পালকি, খচ্চর, শ্রমিক, পর্যটক, ধাবা, পুরোহিত, পূজারি আসে যায় — তার সরকারি হিসেব থাকে। থাকে সিজনাল রেজিস্ট্রেশন। তার জন্য এমনকী যারা কাঁধে করে যাত্রীদের নিয়ে যায়, সেই 'পিঠুবালী'দেরও মাথা পিছু ৭০০ টাকা করে দিতে হয় প্রশাসনকে। তবে দলিত অধ্যুষিত মেখন্ডা গ্রামের দশটি পালকির মালিক লাক্কি জানায়, যদি আশি শতাংশ লিখিত হয়, কুড়ি শতাংশ অলিখিত বা বেআইনি সবকিছুর মধ্যেই আছে। তাদের হিসেব কে রাখে?

কেদারঘাটি যাওয়ার রাস্তার আশপাশের এই গ্রামগুলোতে অন্যান্য পাহাড়ি গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছলতা আছে, তা কেদারকে ঘিরে এই ছ-মাসের ব্যবসার কারণে। লাক্কিলালের কথায় 'কেদার ফ্যাক্টরি'। এটা শুনে যারা কেদার-ব্যবসায় জড়িত নয়, তারা অনেকেই চটে গেল। বাড়াসু গ্রামের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক যেমন বললেন, কেদারে এত লোকের সমাগম ভালো নয়। এখানে আজকাল অনিল আম্বানি এসে পুজো দেয়। এতে তো কোরাপশন বাড়বেই, না? একেকজন পাণ্ডা পুরোহিত কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। এই যে সব ধ্বংস হয়ে গেছে, ফের কি কেদার যাত্রা শুরু হবে? তাঁর কথায়, সরকার বা কোম্পানিগুলো কেদার যাত্রা শুরু করেনি। করেছিল জনসমাজ, সাধু-সন্তরা। ফের কেদারের পথ খুঁজে নেবে ওই জনসমাজই। উত্তর ভারতের জনসমাজ।

তবে আমাদের চিকিৎসা শিবিরের মাধ্যমে আমরা যে চিত্র দেখেছি, তাতে এতটা আশাবাদী হতে পারিনি। চিকিৎসা শিবিরের সংগঠক মুনিশ ভাই বলছিলেন, ২০০১ এবং ২০১১-র জনগণনা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, উত্তরাখণ্ডের অন্তত দুটি পাহাড়ি জেলা, আলমোড়া এবং পৌরিতে জনসংখ্যা কমে গেছে, বাড়ার বদলে। দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ উত্তরাখণ্ডী চলে গেছে। চাষবাসের হাল এখানে ভালো নয়, কারণ নতুন রাজ্য উত্তরাখণ্ডের পথ চলাই শুরু হয়েছিল চাষের বদলে পর্যটনকে উন্নয়নের মূল অক্ষ ধরে নিয়ে। একটা প্রমাণ, আগে এখানে গাড়ি চলতে পারে এমন রাস্তা ছিল ৮ কিমি। গত ১০ বছরে উত্তরাখণ্ডের আমলে তৈরি হয়েছে ১৫ কিমি রাস্তা। কিন্তু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পর্যটনের কারণে ও রাস্তা তৈরির কারোণে মুহুর্মুহু ব্লাস্টিং-এর ফলে নড়ে গেছে পাহাড়। একটু মেঘভাঙা বৃষ্টিতেই ভূমিধ্বসে মারা যায় প্রচুর মানুষ।

গত বছর উখিমঠে এক মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভূমিধসে প্রায় একশো মানুষ মারা গিয়েছিল। এবার ধ্বংস হল কেদারঘাটি পাহাড় থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই হতে পারে রুদ্রপ্রয়াগ জেলাটিকেও।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 5 Issue 3 1August 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

আনন্দ পাঠশালার অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন

২৬ জুলাই, রঞ্জন •

৫ জুন পরিবেশ দিবসে তবু কিছু সরকারি বাদ্যবাজনা বেজেছিল। ১৪–২১ জুলাই অরণ্য সপ্তাহে তাদের সাড়াশব্দ মিলল না।

উৎসাহের ঘাটতি অবশ্য ছিল না একটুও, কামারহাটি পুরসভার পিছনে নিকাশি খাল বরাবর ছড়িয়ে থাকা রবীন্দ্রনগর কলোনির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের। ৫ জুনের পর আবার ২১ জুলাই অরণ্য সপ্তাহের শেষদিনে গাছ লাগানো হবে শুনে ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গতবার যারা গাছ পায়নি, এবার তাদের দিতেই হবে, এমন দাবিও উঠল।

এদিকে ওদের পাড়ায় চওড়া গভীর নালা তৈরির কাজ প্রায় শেষ, অতএব পিছু পিছু এসে গেল বলে ১৬ ফুটের পাকা রাস্তা বানানোর সন্দেশও! আর তার মানেটাও কচিকাঁচারা সবাই এতদিনে জেনে গেছে। অনেকরকম গাছের ছায়ায় ঘেরা এই পল্লির সব গাছ কাটা পড়বে। এই খবরটা চাউর বলেই কি এবার বাড়িতেই গাছ লাগানোর উৎসাহে আরও টগবগ করছে তারা।

বয়স্করা যদিও নির্বিকারই বেশিরভাগ — হতাশা ঢাকেননি এই বলে যে সব গাছই কাটা পড়ে যাবে — বাঁচানো অসম্ভব। অমন পরিমণ্ডলেও তবু বিনা বাধায় গাছ কাটতে দেব না — এমনও বলেই ফেললেন এক মহিলা — জোর গলায় ক্ষোভ ঢেলে দিয়েই।

এভাবে এত সব গাছ কেটে দেবে, এটা আটকানো যায় না? গাছ কাটলে তো গাছ লাগানোরই কথা, লাগায় কই? ১৬ ফুট চওড়া রাস্তাই বা কী হবে আমাদের এখানে? কথাগুলো বলছিল সোমনাথ। 'স্যার, কদমগাছটা কাটতে দেব না', শুভর গলায় উত্তেজনা।

তিনদিন আগে থেকে ওরা প্রায় ১৫–২০ জন মিলে অরণ্য সপ্তাহ পালনের ঘোষণা ছাপানোর ছোটোখাটো পোস্টার সাঁটিয়ে পুরো পাড়াটাকে ভরে দিয়েছিল।২০ জুলাই সুমনা, মমতা, লক্ষ্মীরা বাসে চেপে ঘণ্টা দেড়েকের পথ পেরিয়ে গিয়েছিল সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে। অনেক পরিশ্রম করে প্রচুর গাছ ভরতি ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল।

২১ জুলাই বিকেল পাঁচটার পরে পাড়ার একেবারে শেষ প্রান্তের ঝিলপাড়ে গাছের পায়ে ব্যানার লাগানো হল। 'বাঁচতে হলে বাঁচব গাছ লাগিয়েই। গাছ বাদ করে? বাঁচতে নারাজ, বাঁচব না'।

হাতে হাতে গাছ নিয়ে সার সার দাঁড়াতেই ছবি তুললেন সোমনাথদা, রাজেশ মাটিতে চালাল শাবল, বেজে উঠল শাঁখ। কচি হাতগুলো পরম যত্নে মাটিতে গাছ বসিয়ে, মাটি চেপে দিয়ে, জল দিল। আর এইভাবেই চলল একের পর এক বাড়িতে কাঞ্চন, টেকোমা, বসন্তদূত, বাঁদরলাঠি,

ছবি ইন্টারনেট থেকে

ফলসা, রিঠা, পেঁপে, বকুল গাছ পোঁতা। এবার আর বাসিন্দারা, বিশেষত মহিলারা পারল না ঘরে ঢুকে থাকতে। তারা গাছ চাইল, বলতে লাগল, কোনটা কোথায় বসাতে হবে। রাজেশ, সোমনাথ, শুভ শাবল চালাচ্ছে আর মামপি , পিয়ালি, পূজা, বাবাই, দীপকদের দলবলের উৎসাহে টগবগ করছে পল্লি। রাস্তা বানানোর কারণে গাছ কাটা পড়ার আশঙ্কায় বড়ো নিম বা কৃষ্ণচূড়া–বেল লাগানোই গেল না রাস্তার ধারে।

প্রায় ৩০টা গাছ পোঁতার পর ক্লাবঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শুরু হল গান আর কবিতা আবৃত্তি। এরপর ছোটোবড়ো প্রায় পঞ্চাশজন মিলে শুরু হল পদযাত্রা। পথের দুপাশে বিলি করা হল লিফলেট। তাতে ছিল সড়ক বানাতে গিয়ে গাছ না–কাটার আবেদন। পুরসভার গেটে পৌঁছে শেষ হল অরণ্য সপ্তাহের কর্মসূচি।

সমাজকর্মী চিকিৎসক শোভা ঘোষের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান

অমিতা নন্দী, সন্তোষপুর, ২৪ জুলাই •

কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারে ডাঃ শোভা ঘোষের জন্ম। 'সারা জীবনটাই একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ। মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই প্রথম চ্যালেঞ্জ। ... বাবার মতে, মেয়েদের কেবল হিসেব–নিকেশ আর চিঠি লেখার বিদ্যেটুকু থাকলেই যথেষ্ট আর অল্প বয়সে বিয়ে। সেখানে লেখাপড়া শুরু করা, চালিয়ে যাওয়া, মেডিকাল কলেজে পড়তে যাওয়া — প্রতিটি মুহূর্তে যেন ঢেউ ঠেলে ঠেলে এগোনো।' কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করার কয়েকবছর পরে ১৯৫৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিলেতে যান। দশ–এগারো বছর ইংল্যান্ডে থেকে দক্ষ স্ত্রী–রোগ বিশেষজ্ঞ এবং ক্যানসারবিদ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। দেশে ফিরে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল থেকে শুরু করে বহু হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের কাজে জড়িয়ে থেকেছেন দীর্ঘদিন ধরে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের এবং শিশুদের পুষ্টি খাদ্য স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের বহুবিধ কার্যক্রমে যুক্ত থেকেছেন। নিজের পেশার পাশাপাশি সমাজের দুঃস্থ–অনাথ মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন সারা জীবন।

তিনি শুধু একজন চিকিৎসকই ছিলেন না, একজন অত্যন্ত সমাজ–মনস্ক চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও পড়াশোনা। জাপানের ফুকুশিমায় পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনায় অত্যন্ত আলোড়িত হন, পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট মত ছিল। মন্থন সাময়িকী এবং সংবাদমন্থন পত্রিকার তিনি নিয়মিত উৎসাহী পাঠক ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু লেখাও এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, মূলত 'সত্যবতী' ছদ্মনামে। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় চড়াই পাখিরা কোথায় কেন হারিয়ে গেল তা জানার জন্য একসময় তিনি খুব উৎসুক হয়ে আমাদের বলেছিলেন আসানসোল থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার ওই বিশেষ সংখ্যাটি জোগাড় করে দিতে। পত্রিকাটির সব কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় তার জেরক্স–কপি হাতে পেয়ে শিশুর মতো আনন্দ। কে বলে তিনি 'বৃদ্ধা'? তাঁর শরীরের বয়স হয়েছিল, মনের নয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেই লড়াকু মনেরই পরিচয় তিনি দিয়ে গেলেন।

মৃত্যুর উপলক্ষ্য একটা দুর্ঘটনা। বাড়িতে পুজোর সময় মোড়ায় বসে তিনি যখন ধুনো জ্বালছিলেন, সামনে পুরোহিতমশাই তখন পুজোয় ব্যস্ত। পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ মাকে খাওয়ানোর জন্য। মাত্র দশ

জন্ম ৭ জানুয়ারি ১৯২৫; মৃত্যু ২৩ জুলাই ২০১৩

মিনিট সময়। পরনের সিন্থেটিক শাড়িতে আগুন লেগে গেছে বোঝার পর এতটুকু চেঁচামেচি হইচই না করে স্নানঘরে গিয়ে শাওয়ার খুলে আগুন নেভান, ঘরে এক ঢিলেঢালা পোশাক পরে নিজেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। ততক্ষণে শরীরের ৬০–৭০ ভাগ অগ্নিদগ্ধ। ইতিমধ্যে ওই পরিচারিকা এবং ওঁর স্নেহধন্য এক ব্যক্তি এসে পড়েন। নিজেই ফোন করে কাউকে কাউকে খবর দেন এবং ওঁকে চিকিৎসার জন্য কোনো নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে বলেন। দুপুর একটায় দুর্ঘটনাটি ঘটে, সন্ধ্যা ৬টার পর তিনি জ্ঞান হারান। তার আগে নিজেই পুলিশকে বয়ান দেন এবং ওই বীভৎস দহনজ্বালা সহ্য করেন, এতটুকু কাতরোক্তি শোনা যায়নি। পরদিন দুপুর একটায় শেষ হয় তাঁর লড়াই।

তাঁর জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আর তাঁর মরণের সময়েও তিনি আমাদের শিখিয়ে গেলেন কীভাবে সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।

ঐতিহ্যকে সম্বল করে সামাজিক আন্দোলন গড়তে গঙ্গা উৎসব

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ২৩ জুলাই •

গঙ্গা নদী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঙ্গা উৎসব পালিত হল শান্তিপুরে। গঙ্গা পূজার দিন ভাগীরথী গঙ্গার তীরে শুগান আশ্রমে 'শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি'র উদ্যোগে 'গঙ্গা উৎসব' পালিত হল। সারাদিন ধরে এই উৎসবে স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষ, ধীবর, ছাত্র–ছাত্রী সহ বহু মানুষ যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শঙ্করাচার্য রচিত 'গঙ্গা স্তোত্র' এবং মহামুনি বাল্মীকি রচিত 'গঙ্গাষ্টকম' উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করা হয়। এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' গান সহ গঙ্গা মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী বিভিন্ন গান গেয়ে শোনান শ্রীষষ্ঠী দত্ত। 'গঙ্গা' সম্পর্কিত বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন সুরজিৎ সাহা, পূরবী মজুমদার, ও সফিউল আনসারি।

গঙ্গা উৎসব কেন — এই মর্মে উপস্থাপিত বক্তব্যে শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদক ডঃ গৌতম কুমার পাল বলেন, গঙ্গা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রের জীবন রেখা (Life line)। সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে ৪০ কোটি মানুষ গঙ্গার ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এছাড়া আরও নানাভাবে পানীয় জল, কৃষি, জলবায়ু, মাছ উৎপাদন, পণ্য পরিবহন, জলপথ সহ সাহিত্য–দর্শন–সংস্কৃতিচর্চা বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গঙ্গা সমৃদ্ধশালী করেছে।

প্রতিবছর গঙ্গার খাত ধরে ৫২৫ ঘন কিমি জল আর ৭৩ কোটি টন পলি ভেসে আসে। গঙ্গা নদীর এই কার্যকারিতা জানা সত্ত্বেও গঙ্গার দুধারে গড়ে ওঠা শহর ও কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং রাসায়নিক সার মিশ্রিত জল নদীতে ফেলে গঙ্গা দূষণ ঘটানো হচ্ছে। এই দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন শিল্প (২৫ শতাংশ) আর বিভিন্ন শহরের বর্জ্য পদার্থ (৭৫ শতাংশ)। এর মধ্যে ফুল বেলপাতা, হাসপাতাল–নার্সিং হোমে ব্যবহৃত বর্জ্য, মৃতদেহ দাহ করা পরিত্যক্ত বর্জ্যও ফেলা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ, ছাত্র–ছাত্রীসহ সর্বস্তরে সেইভাবে গঙ্গা দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিকল্পনাটি সেই অর্থে কার্যকরী হতে পারেনি। তাই গঙ্গা নদীর ঐতিহ্য কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি 'গঙ্গা উৎসব' প্রবর্তন করল এই বছর এবং গৌতম পাল আশা প্রকাশ করেন এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষকে এতদঞ্চলে আরও সচেতন করা সম্ভব হবে। ঐতিহ্যকে সম্বল করেই সামাজিক আন্দোলন শক্তিশালী করা সম্ভব বলে গঙ্গা পূজার দিনকে গঙ্গা উৎসব পালন করার দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কলকাতার সবুজ মঞ্চের প্রতিনিধি শ্রীমতী পামেলা মুখোপাধ্যায় বলেন গঙ্গা নদীতে স্নান করার সময় আমরা যেন কেউ মল–মূত্র ত্যাগ না করি এবং অন্যদেরও সে সম্পর্কে সচেতন করি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রী কুণাল ঠাকুর। তিনি শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সহায়তার আশ্বাস দেন। সন্ধ্যায় অসংখ্য প্রদীপ নদীতে ভাসিয়ে এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পর সন্ধ্যায় স্থানীয় রায় কোচিং সেন্টার –এর ছাত্র–ছাত্রীরা সুকুমার রায়ের নাটক 'অবাক জলপান' মঞ্চস্থ করে।

খ ব রে দু নি য়া

ফের তিব্বতী যুবকের আত্মাহুতি

কুশল বসু •

২০ জুলাই তিব্বতের সিচুয়ান অটোনমাস প্রিফেকচারের গাবা–র জোয়গে মঠের মাত্র ১৮ বছর বয়সি সন্ন্যাসি কনচক সোনাম তাঁর মঠের বাইরে এসে গায়ে আগুন লাগিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিব্বতের এই এলাকায় চীনা সরকারের অত্যাচার সবচেয়ে বেশি। সোনাম ছিলেন পড়াশুনায় অসাধারণ। তিনি বন্ধুদের বলেন যে চীনা শাসনের অধীনে এখানে অসহ্য অত্যাচার। এই ঘটনার পর ওই মঠের এলাকায় এবং আরও কয়েকটি শহরে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। 'রেডিও ফ্রি এশিয়া' জানায়, শত শত তিব্বতী ঘটনাস্তলে জমায়েত হয়ে চীনা প্রশাসনকে সোনামের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। প্রসঙ্গত, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে এপর্যন্ত চীন ও চীন অধিকৃত অঞ্চলে মোট ১২১ জন তিব্বতী স্বাধীনতার দাবিতে আত্মাহুতি দিলেন।

সূত্র : ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর টিবেট।

'মানুষের দখলদারিতে উত্তরাখণ্ড ও হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলি ক্রুদ্ধ হয়েছে'

হিমালয়ের বন্যায় নেপালের বিপর্যয়

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

গঙ্গা–মহাকালী অববাহিকায় বিপর্যয় নিয়ে গত ২২ জুলাই নেপালের কাঠমাণ্ডুতে একটি আলোচনাসভা হয়। 'পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর হিমালয়া এরিয়া রিসার্চ' সংক্ষেপে পাহাড়–এর প্রতিষ্ঠাতা শেখর পাঠক বলেন, ' গত একশো বছর যাবৎ মানুষের দখলদারিতে উত্তরাখণ্ড ও হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলি ক্রুদ্ধ হয়েছে। ঘটনার যে রিপোর্ট মিডিয়া করেছে, তার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে এবং তা উত্তরাখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পূর্ব হিমাচল প্রদেশ এবং পশ্চিম নেপালেও তা ছড়িয়েছে।

আশঙ্কা করা যাচ্ছে, তীর্থযাত্রীদের বয়ে নিয়ে যায় যে দশ থেকে পনেরো হাজার লেবার, তারা শেষ হয়ে গেছে। এদের অনেকেই আসে পশ্চিম নেপাল থেকে। শ্রী পাঠক আরও বলেন, উত্তরাখণ্ডের সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ২৪টি বাঁধ (ড্যাম) বন্যায় ভেসে গেছে। বিষ্ণুগঙ্গা নদীর ওপর জে পি পাওয়ার প্রজেক্ট প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। এরা সুড়ঙ্গ ও রাস্তা তৈরির জন্য হাজার হাজার টন ডিনামাইট ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে।

নেপাল–ভারত সীমান্তে ভারতের ধারচুলা শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু নেপালের দারচুলা শহর মহাকালী নদীর তাণ্ডবে ভেঙেচুরে গেছে। 'রেড ক্রস'–এর পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, মহাকালী ও কর্নালী নদীর বন্যায় নেপালের ৫৯ জন মারা গেছে, ২৯ জন আহত হয়েছে এবং ২০৭৯টি পরিবার গৃহহীন হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যায় নেপালের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি কোনোদিনও জানা যাবে?

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল
: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জীতেন কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Shamik Sarkar.